৭

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই বিশেষ করে বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে চলে স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ। ১৭৬৩ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে ও মাত্রায় এসব আন্দোলন চলতে থাকে। ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ, জোর করে ধানের জমিতে নীল চাষে কৃষকদের বাধ্য করা– এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এই আন্দোলনসমূহের উদ্দেশ্য হলেও সামগ্রিকভাবে এগুলো সবই ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফকির ও সন্ন্যাসীদের প্রতিক্রিয়া, হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ও দুদু মিয়ার ফরায়েজি আন্দোলন এবং নীল চাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বাংলায় সংঘটিত এসব ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. ফকির-সন্ন্যাসী ও ফরায়েজি আন্দোলন
- পাঠ-২. তিতুমীর ২০৯
- পাঠ-৩. নীল বিদ্রোহ

পাঠ - ১

ফকির-সন্ন্যাসী ও ফরায়েজি আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *বাংলায় ফকির ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পরিচয় পাবেন;*
- *ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কারণ ও বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারীদের সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজি শরীয়তউল্লাহ্, দুদু মিয়া ও এই আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

১৭৫৭ খ্রি. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বাংলার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে আস্তে আস্তে বাংলার অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব পড়তে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করে বা নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ফলে অনেকক্ষেত্রেই এদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীরা এতোদিন ধরে যেসব অধিকার বা সুযোগ পেয়ে আসছিল, তাতে আঘাত আসে। এসবের বিরুদ্ধেই তারা গড়ে তোলে বিভিন্ন আন্দোলন বা বিদ্রোহ।

ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ ছিল বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রি.– এই দীর্ঘ সময় ধরে চলে ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ।

এই ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিলেন বাংলারই অধিবাসী। ফকিরেরা ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ের মাদারিয়া শ্রেণীভুক্ত। আর সন্ন্যাসীরা ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু যোগী। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা মুঘল সাম্রাজ্যের সৈন্যদল থেকে বাদ পড়া সদস্য, আবার অনেকে ছিলেন ভূমিহীন কৃষক। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিলেন এদেশেরই স্থায়ী অধিবাসী। ধর্মীয় দিক থেকে ফকির-সন্ন্যাসীদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ফকির-সন্ন্যাসীদের মধ্যে মিলনের সাধারণ ক্ষেত্র তৈরি করে এবং তারা একই পতাকাতলে সমবেত হন।

বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল এবং এটি ছিল সে সময়কার বাংলায় কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, কোম্পানি কর্তৃক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি ফকির-সন্ন্যাসীদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ফকির ও সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপ ছিল মুক্ত ও স্বাধীন। তবে কোম্পানি শাসনের শুরু থেকেই তাদের স্বাধীন গতিবিধি বাধা পায়। তারা বাধা পেতে থাকে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে। ধর্মস্থান বা তীর্থস্থান পর্যটন ভারতবর্ষের একটি অতি প্রাচীন সামাজিক ও আত্মিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ফকিরেরা যেমন বাংলার বিভিন্ন দরগা বা মাজার জিয়ারত করতেন, তেমনি সন্ন্যাসীরাও পূণ্যকর্ম করার অভিলাষে বাংলার বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন। কোম্পানির স্থানীয় প্রশাসন প্রথমে ফকির-সন্ন্যাসীদের তীর্থযাত্রায়

বাধা দেয় এবং পরে আইন করে এই নিষেধাজ্ঞাকে দৃঢ় করা হয়। সামাজিক ও আত্মিক অধিকার হরণের পাশাপাশি ফকির-সন্ন্যাসীদের অর্থনৈতিক অধিকার হরণের অভিযোগও এর সাথে সংযোজিত হয়। কোম্পানি শাসনপ্রসূত অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে ফকির-সন্ন্যাসীরা বঞ্চিত হন তাদের চিরাচরিত ভিক্ষা সংগ্রহের অধিকার হতে। নিম্নশ্রেণীর রায়তদের অবলুপ্তির ফলে ফকির-সন্ন্যাসীদের দাবী অগ্রাহ্য হয় এবং তারা জমিদারদের বাড়ি, কাছারি ও কোম্পানির কুঠি আক্রমণ করেন।

ফকির-সন্ন্যাসীদের প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত হয়। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত চলতে থাকা তাদের এই সশস্ত্র আন্দোলন ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছিল। ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল কোম্পানির কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও নায়েব-গোমস্তাদের বাড়ি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দেশীয় সহযোগীদেরকেও ফকির-সন্ন্যাসীরা শত্রু হিসেবে মনে করেন এবং তাদের ওপর আক্রমণাত্মক তৎপরতা পরিচালনা করেন। এছাড়া কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের সহযোগী দেশীয় বেনিয়াদের নৌকা আক্রমণ, সৈন্যবাহিনীর রসদ পরিবহন বন্ধ করা এবং যোগাযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করা– এগুলোও ছিল কোম্পানির বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের গৃহীত ব্যবস্থা।ফকির-সন্ন্যাসীরা অস্ত্র হিসেবে বর্শা, তরবারি ও গাদা বন্দুক ব্যবহার করতেন। মূলত নেতৃস্থানীয়রা ব্যবহার করতেন ঘোড়া। ফকিরদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ। পরবর্তী সময়ে তার উত্তরাধিকারীরা ছিলেন মুসা শাহ, পরাগল শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সোবাহান শাহ, মাদার বক্স, জরি শাহ, করিম শাহ প্রমুখ। সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক।

১৭৬৩ খ্রি. সর্বপ্রথম বাকেরগঞ্জে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কুঠি ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং সন্ন্যাসীরা সেখানকার ফ্যাক্টরি প্রধান কেলিকে ঘেরাও করে রাখেন। ঐ বছরই ফকিরেরা ঢাকা ফ্যাক্টরি আক্রমণ করেন; আক্রমণের তীব্রতা দেখে এই ফ্যাক্টরির প্রধান লেস্টার কর্মস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যান।পরে অবশ্য ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ফ্যাক্টরিটি পুনরুদ্ধার করেন। সন্ন্যাসীরা ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দেই রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় কোম্পানির কুঠি আক্রমণ করেন। ১৭৬৯ খ্রি. উত্তরবঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসীদের তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য ক্যাপ্টেন ডি. ম্যাকেনজিকে একদল সৈন্যসহ রংপুরে পাঠানো হয়। ১৭৭০ খ্রি. বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের (যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হিসেবে পরিচিত) সময় ও মন্বন্তর পরবর্তী সময়ে ফকির-সন্ন্যাসীদের আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় এই আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। ১৭৭২ খ্রি. রাজশাহী জেলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের তৎপরতার প্রচন্ডতা দেখা যায়। ঐ বছরই রংপুরে সন্ন্যাসীদের হাতে নিহত হন রংপুরের সুপারভাইজার পালিং। ১৭৭৬ খ্রি. আবার উত্তরবঙ্গের বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুরে ফকির-সন্ন্যাসীদের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ময়মনসিংহের আলাপসিংহ পরগণায় এদের তৎপরতা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে মজনু শাহ মহাস্থানগড়ের দিকে অগ্রসর হন। ১৭৮৬ খ্রি. মজনু শাহের সাথে কোম্পানির সৈন্যদলের পরপর দু'টি সংঘর্ষ ঘটে। এ সময়ের সংঘর্ষে মজনু শাহ তাঁর বহুসংখ্যক অনুসারীকে হারান। ১৭৮৭ খ্রি. মজনু শাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য উত্তরসূরীরা পুরো আঠারো শতক পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তবে আস্তে আস্তে এর গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। কোম্পানির উন্নততর রণকৌশল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামরিক প্রযুক্তির কাছে ফকির-সন্ন্যাসীদের পরাজয় ছিল অনিবার্য। অন্যদিকে যথোপযুক্ত ও শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি ও সুদৃঢ় নেতৃত্বের অভাব শেষ পর্যন্ত ফকির-সন্ন্যাসীদের পরাজয় এবং বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

ফরায়েজি আন্দোলন

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি সুসংহত শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন ফরায়েজি নেতৃবৃন্দ। ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, কিন্তু এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে।

ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। তিনি ১৭৮১ খ্রি. বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা ও হুগলীতে প্রাথমিক পড়াশোনার পর তিনি আঠারো বছর বয়সে মক্কায় যান। সেখানে থাকাকালে তিনি ওয়াহাবি আদর্শ ও আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রায় কুড়ি বছর সেখানে অবস্থানের পর তিনি দেশে ফিরে ধর্ম সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আদর্শগত দিক দিয়ে ফরায়েজি ও ওয়াহাবিদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বরং বলা যায়, ওয়াহাবি আন্দোলনেরই আরেকটি ধারা ফরায়েজি আন্দোলন। হাজী শরীয়তউল্লাহ বিশ্বাস করতেন, বিদেশী বিধর্মীদের রাজত্বে ইসলামি জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে না। এটি সম্ভব কেবলমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রে। ভারতবর্ষ যেহেতু বিদেশী বিধর্মী ইংরেজ জাতির শাসনাধীন, সে কারণে এই দেশটি 'দারুল হারব'। শত্রু শাসিত দেশে যেসব মুসলমান বসবাস করে তাদের পক্ষে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশাসনসমূহ যথার্থভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি স্বদেশের মুসলমানদের জুম'আ ও ঈদের নামাজ না পড়ার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তিনি পীর পূজা, পীরের দরগায় ওরস, মানত ও মহররম পালনের ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, এগুলো ইসলামের মূল বিধানের পরিপন্থী। ফরায়েজ আরবি শব্দ, এর অর্থ অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ। পবিত্র কুরআনে যে পাঁচটি অবশ্য পালনীয় (ফরজ) মৌলনীতির কথা বলা হয়েছে তা যথার্থভাবে পালনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পাঁচটি ফরজ হলো– ঈমান বা আল্লাহ্‌র একাত্ম ও রিসালাত, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ইসলামি সাম্যবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোষণা করেন, সকল মুসলমান ভাই ভাই, অতএব মুসলিম সমাজে অসাম্য ও বর্ণ বা শ্রেণীভেদের কোন স্থান নেই। এই মতাদর্শের ভিত্তিতে তিনি মুসলমান সমাজে বিদ্যমান উচ্চ ও নিু শ্রেণী অর্থাৎ আশরাফ ও আতরাফ-এর শ্রেণী বৈষম্য দূর করার চেষ্টা চালান। তাই স্বাভাবিকভাবেই শোষিত আতরাফ মুসলমান পেশাজীবীর লোকেরা শরীয়তউল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হন। দরিদ্র মুসলমান কৃষক, রায়ত, তাঁতি, জোলা সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর সাথে যোগ দেয়ায় ফরায়েজিদের সংখ্যা বেড়ে যায়। অত্যাচারী নীলকর ও জমিদারদের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভের আশায় এই আতরাফেরা হাজী শরীয়তউল্লাহর মধ্যে তাদের নেতাকে খুঁজে পেল। তাঁর মতবাদ পূর্ব বাংলায় ব্যাপক সাড়া জাগায়। তিনি জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। অপরদিকে নির্যাতিত মুসলমানেরা একজন সুশিক্ষিত ধর্মনেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে দেখে স্থানীয় জমিদারগণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মুসলমান রায়তদের ওপর জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ফরায়েজিদের প্রতিরোধ আন্দোলনও জোরদার হতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোষক শ্রেণীর প্রবল আক্রমণের মুখে ফরায়েজি আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৮৪০ খ্রি. হাজী শরীয়তউল্লাহ মারা যান।

আঠারো শতকের শেষ দিকে যেসব আন্দোলন বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ফরায়েজি আন্দোলন তন্মধ্যে অন্যতম। এটি ছিল মূলত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে ফরায়েজি আন্দোলন একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেয়। নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারে মুসলমান শোষিত সম্প্রদায় যখন জর্জরিত, তখন এই সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হাজী শরীয়তউল্লাহ এগিয়ে আসেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ মহসিন উদ্দিন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮১৯ খ্রি. দুদু মিয়ার জন্ম। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি পিতার কাছে কুরআন ও হাদিস শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই তিনি হজ্জ করতে মক্কা যান এবং সেখানে ওয়াহাবি ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। দেশে ফিরে তিনি পিতার মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তবে তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ছিল অসাধারণ। এই কারণে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই মুসলিম সমাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বেই ফরায়েজি আন্দোলন অনেক বেশি শক্তিশালী রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে। পিতার মত তিনি কেবল ধর্মীয় সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেননি, বরং তিনি সমাজের নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধিসমূহ নির্মূল করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, সমাজের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং দরিদ্রদেরকে শোষণ ও নির্যাতনের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। তবে কেবল মুক্তির বাণী প্রচারের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করা যায় না, তা করতে হলে আন্দোলন এমনকি প্রতিরোধ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হবে।

দুদু মিয়া মনে করতেন, বিশ্বের মালিক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং ভূসম্পত্তিসহ সকল প্রকার পার্থিব সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকও আল্লাহ্। তাই কর বা খাজনা যদি দিতে হয়, তবে তা আল্লাহ্র পথে দিতে হবে, কোন ব্যক্তিকে নয়। সে সময়কার জমিদারেরা রায়তদের ওপর যে সমস্ত খাজনা ও কর আরোপ করেছিল, দুদু মিয়া সেগুলোকে বেআইনি ও নীতি-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা দেন।

নিপীড়িত রায়ত ও চাষীদেরকে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য দুদু মিয়া বাংলার পুরনো ঐতিহ্যবাহী সংগঠন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়-বিচারের ভিত্তিতে সব ধরনের ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকাদ্দমা সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করেন।

একজন সুদক্ষ সংগঠক হিসেবেও দুদু মিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফরায়েজি আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন তিনি। দুদু মিয়া ফরায়েজি সমাজ ব্যবস্থায় সুবিন্যস্ত একটি খিলাফত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গকে তিনি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ একজন খলিফা নিযুক্ত করেন।আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা নিজ এলাকার ফরায়েজি মতাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ রাখা, তাদের ওপর যেকোন প্রকার অত্যাচার প্রতিহত করা ছাড়াও আন্দোলন পরিচালনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করতেন।

দুদু মিঞা ইংরেজ প্রশাসনের সাহায্যপুষ্ট জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের নিযুক্ত ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালদের মোকাবিলায় ফরায়েজি লাঠিয়াল বাহিনীও প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক ফরায়েজি গ্রাম থেকে বলিষ্ঠ জোয়ানদের বাছাই করে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এই লাঠিয়াল বাহিনীর সাহায্যে দুদু মিয়া ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফরিদপুরের রায়ত ও চাষীদেরকে স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের হয়রানি থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে কারাগারে আটক করে। ১৮৬২ খ্রি. (মতান্তরে ১৮৬০ খ্রি.) তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর এই আন্দোলন অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে বিলীন হয়ে যায়। বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুদু মিয়া যে অবদান রেখেছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রধান নেতা হয়েও তিনি নির্যাতিতদের দুর্দশা দূর করতে এগিয়ে আসেন।আর এর জন্য তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের পথ গ্রহণ করেছিলেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের সহযোগী নীলকরদের বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের আন্দোলন এ অঞ্চলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ আন্দোলন। এছাড়া আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে শুরু হওয়া হাজী শরীয়তউল্লাহ ও পরবর্তী সময়ে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন মূলত একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও এটি প্রতিরোধ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*, প্রথম খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৩।
২। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা, ১৯৯০।
৩। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০–১৮৫৭ খ্রি.)*, ঢাকা, ১৯৯২।
৪। সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯২।
৫। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৭।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ফকির আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
(ক) হাজি শরীয়তউল্লাহ (খ) দুদু মিয়া
(গ) মজনু শাহ (ঘ) তিতুমীর।

২। সন্ন্যাসী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কে ছিলেন?
(ক) ভবানী পাঠক (খ) দেবী চৌধুরাণী
(গ) রাজ বল্লভ (ঘ) মজনু শাহ।

৩। ফকিরেরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন?
(ক) মাদারিয়া (খ) ওয়াহাবি
(গ) বেদান্ত (ঘ) তবলীগ।

৪। ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
(ক) তিতুমীর (খ) দুদু মিয়া
(গ) সৈয়দ আহমদ বেরেলভি (ঘ) হাজী শরীয়তউল্লাহ।

৫। হাজি শরীয়তউল্লাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) মাদারীপুর (খ) খুলনা
(গ) ময়মনসিংহ (ঘ) হুগলি।

৬। দুদু মিয়ার প্রতিনিধিদের কি বলা হতো?
(ক) সুলতান (খ) খলিফা
(গ) মাতবর (ঘ) মোড়ল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের আন্দোলনের কারণ কি ছিল?
২। ফকিরদের আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয়েছিল?
৩। ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল?
৪। দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনকে সংগঠিত করতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের বর্ণনা দিন।
২। ফরায়েজি আন্দোলনের বর্ণনা দিন।

পাঠ - ২

তিতুমীর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *তিতুমীর সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *তিতুমীরের ইংরেজ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *তিতুমীরের আন্দোলন ও এই আন্দোলনের ব্যর্থতা বর্ণনা করতে পারবেন।*

পলাশীর যুদ্ধের পর একশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলার মুসলমানেরা চরম অধপতনের সম্মুখীন হন। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানেরা রাজ্যহারা হয়। সামরিক ও অন্যান্য লোভনীয় প্রশাসনিক চাকুরি থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় যে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান জমিদার ছিলেন, তারাও তাদের জমিদারী হারান। ইংরেজরা তাদের শাসনের শুরু থেকেই মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখতো, কেননা তাদের কাছ থেকেই তারা বাংলার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। আবার একই কারণে মুসলমানেরাও ইংরেজদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের এই অধপতনের বিষয়টি কিছু সমাজ সংস্কারককে আলোড়িত করে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে কয়েকজন মুসলমান ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। এঁরা মুসলিম সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারসমূহ দূর করে মুসলমানদের মধ্যে একটি ঐক্য সৃষ্টি করা এবং একই সাথে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকেন। এই একই উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে পরিচালিত ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব বাংলাতেও লক্ষ্য করা যায়। তবে বাংলায় বিশেষ করে ইংরেজ নীলকর ও উচ্চ বর্ণের হিন্দু জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণ নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচার জন্য দরিদ্র চাষী, তাঁতি ও জোলা শ্রেণী সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে অগ্রসর হয়। বাংলায় এই প্রতিরোধ সংগ্রামের অন্যতম নেতা ছিলেন ওয়াহাবি আদর্শের অনুসারী তিতুমীর।

তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী, কিন্তু তিতুমীর নামেই তিনি বেশি পরিচিত। ১৭৮২ খ্রি. চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি লেখাপড়া করেন গ্রামের এক মাদ্রাসায়। এ সময় থেকেই দু'টি গুণের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে; একদিকে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন শক্তিশালী ও অসম সাহসী। গ্রামেরই একটি ব্যায়ামাগারে অনুশীলন করে একজন কুস্তিগীর হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এক সময় নদীয়ার জমিদারের অধীনে লাঠিয়ালের চাকরিও গ্রহণ করেন। উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান। সেখানে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভির সংস্পর্শে এসে তিতুমীর তাঁর আদর্শ ও মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। চার বছর পর দেশে ফিরে এসে তিনি কলিকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে অবশেষে নারিকেলবাড়িয়ার কাছে হায়দারপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এ সময়েই তিনি ধর্ম সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্থানীয় অনেক চাষী ও তাঁতি তাঁর অনুসারী হয়।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন আর জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে নিম্নবর্ণের মুসলমানেরা তখন বিপর্যস্ত ও সর্বশান্ত। এদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিতুমীর প্রথমে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করা বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হলেন। পীর মানা, কবরের ওপর মাজার তৈরি করা, পীরের মাজারে গান-বাজনা, মৃতদের উদ্দেশ্যে শিরনি দেওয়া তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর শিক্ষা ছিল ইসলাম ধর্মের মৌল বিষয়গুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করা আর অন্য ধর্মের যেসব কুসংস্কার ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে তা বর্জন করা। মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা ইসলাম বিরোধী রীতি-নীতির বিরুদ্ধেই তিতুমীরের আন্দোলনের সূচনা হয়। তিতুমীরের এই আন্দোলনের ফলে একদিকে যেমন তাঁর অনুসারী একটি দল সৃষ্টি হয়, আবার অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন, যারা এসব রীতি-নীতি বা কুসংস্কার ছাড়তে রাজি ছিলেন না। ফলে তিতুমীর ও তাঁর সংস্কারপন্থীদের সাথে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরোধ দেখা দেয়। আবার তিতুমীরের অধীনে কৃষক-প্রজাদের সংগঠিত হতে দেখে হিন্দু জমিদারেরা তিতুমীরের সংস্কার আন্দোলনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে তিতুমীরের সাথে হিন্দু জমিদারদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারদেরকে সরকারের কাছে নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব পরিশোধ করতে হতো। এর ফলে জমিদারিতে তাদের একচেটিয়া অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে তারা চাষী রায়তদের কাছ থেকে ভূমি কর ও অন্যান্য কর আরোপ করে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে আদায় করতো। অনেক সময় হিন্দু জমিদারেরা তাদের পূজা পার্বণের জন্যেও প্রজাদের কাছ থেকে জবরদস্তি কর আদায় করতো; অনেক সময় তাদেরকে আটকও করতো। নারিকেলবাড়িয়ার অধিকাংশ প্রজা ছিল মুসলমান তাঁতি ও কৃষক, তাই তারা সংগঠিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে জমিদারদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং শিগগিরই উভয়পক্ষে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

জমিদারেরা দাড়ির ওপর কর আরোপ করলে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই দাড়িকর তিতুমীর ও জমিদারদের মধ্যে সংঘর্ষের তাৎক্ষণিক কারণ। বিশেষ করে গুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ ও পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় দাড়িকর নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেন। তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা এই কর দিতে অস্বীকার করলে জমিদার লাঠিয়াল পাঠিয়ে তাদের উপর হামলা করে। প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ করে বারাসতে মামলা দায়ের করে এমনকি কলিকাতার কমিশনারের কাছে প্রতিকার চেয়েও তারা ব্যর্থ হয়। তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা বুঝতে পারে ইংরেজ সরকার জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতেই বেশি আগ্রহী, চাষীদের ভালমন্দের ব্যাপারে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী একেবারেই উদাসীন। তাই তারা নিজেরাই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়।

তিতুমীরের দলের সাথে সংঘর্ষ বাধে জমিদারদের। নওঘাটার জমিদার দেবনাথ রায় তাদের হাতে নিহত হন। এরপর জমিদারদের সাথে আরো দু'টি সংঘর্ষে তিতুমীরের বাহিনী জয়লাভ করে। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস এতো বেড়ে যায় যে, তারা ইংরেজদের ক্ষমতার কথা ভুলে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসন পুনপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করে। জমিদারেরা নীলকরদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, তিতুমীরের সংগ্রাম মূলত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। জমিদারদের প্ররোচণায় মোল্লাহাটির নীলকর ডেভিস তিতুমীরকে আক্রমণ করে পরাজিত হয়। তিতুমীরের দল প্রতিশোধ নিতে নীলকুঠি আক্রমণ করে লুটপাট করে। এর ফলে আশেপাশের এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি হয়। জমিদার ও নীলকর সাহেবেরা সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। ইংরেজ সরকার অত্যন্ত দ্রুত সাড়া দেয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার ১২৫ জনের একটি পুলিশ বাহিনী নিয়ে নারিকেলবাড়িয়ায় পৌঁছলে তিতুমীরের দল হঠাৎ তাদের আক্রমণ করে। অপ্রস্তুত ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার তার দল নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও কয়েকজন সিপাহী ও বরকন্দাজ ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এই বিজয়ে বিদ্রোহীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। তারা আশেপাশের নীলকুঠিগুলো লুট করে। এরপর নদীয়ার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ২৫০ জন পুলিশ ও বেশ কিছু হাতি নিয়ে নারিকেলবাড়িয়া যান, জেলার নীলকর

সাহেবরাও তাদের লোকজন নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তিতুমীরের বিরাট বাহিনী ঢাল, তলোয়ার, লাঠি, বর্শা, সড়কি নিয়ে এই দলের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করলে ম্যাজিস্ট্রেট তার দলবল নিয়ে পালিয়ে যান। এখানে সরকার পক্ষের অনেকে আহত হয়।

বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার কলিকাতা পৌঁছে সরকারকে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে তিতুমীরের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। ইংরেজ সরকার এবার আরো চিন্তিত হয়ে পড়ে; তারা পুরো ব্যাপারটিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা বলে মনে করে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার নারিকেলবাড়িয়ায় একটি নিয়মিত ও শক্তিশালী বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে, তিতুমীর ইংরেজ বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে দেশী পদাতিক বাহিনীর ১১টি রেজিমেন্ট, কয়েকটি কামানসহ গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাদল নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী নারিকেলবাড়িয়ায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। কেল্লার বাইরে এসে তিতুমীর বীরবিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সুশিক্ষিত ইংরেজ বাহিনীর প্রচন্ড গোলাবর্ষণে তিতুমীরের বাহিনী বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কামানের গোলার আঘাতে স্বাভাবিকভাবেই তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। যুদ্ধ করতে করতেই তিতুমীর তাঁর প্রায় ৫০ জন অনুসারী সহ নিহত হন। বিদ্রোহীরা উপায়ন্তর না দেখে আত্মসমর্পণ করে। উন্মত্ত ইংরেজ সৈন্যরা তিতুমীর ও তাঁর সহযোগীদের মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেয়। পরে কলিকাতায় তিতুমীরের অনুসারীদের বিচার করা হয়। প্রহসনমূলক একতরফা এই বিচারে তিতুমীরের অনুসারীদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড দেওয়া হয়। তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুমকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এভাবে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

তিতুমীরের এই আন্দোলনের স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। একে সংস্কার আন্দোলন, প্রজা বিদ্রোহ আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ আন্দোলনটিতে এই তিনটি উপাদান সম্মিলিতভাবেই কাজ করেছে বলে মনে করা হয়। তিতুমীর ওয়াহাবি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার প্রচেষ্টাই প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি ইসলামের মহান সংস্কারক সৈয়দ আহমদ বেরেলভির সান্নিধ্য লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে তিতুমীর সমাজ সংস্কারে মনোযোগ দেন। এভাবেই তাঁর একদল অনুসারী গড়ে ওঠে এবং তিতুমীর এদের নেতৃত্ব দেন। তিতুমীরের আন্দোলনে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বহিপ্রকাশও ঘটেছিল। বিশেষ করে আন্দোলনের একটি পর্যায়ে কয়েকটি ধারাবাহিক সফলতার পর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিতুমীর ও তাঁর দল এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে আবার মুসলিম শাসন পুনপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে তিতুমীরকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বলে এই বিদ্রোহকে প্রজা বিদ্রোহও বলা হয়ে থাকে। তবে একে কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা ঠিক হবে না। কেবলমাত্র ঘটনাচক্রেই জমিদারেরা সকলে ছিলেন হিন্দু এবং এই জমিদারদের বিরুদ্ধেই তিতুমীরকে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল। তবে জমিদারেরা তিতুমীরের অনুসারীদের কাজে-কর্মে বাধা না দিলে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়তো হতো না। তিতুমীরের এই আন্দোলন শুধুমাত্র নারিকেলবাড়িয়া অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাদের এই সংহতি, চেতনা আঞ্চলিক সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি। এ কারণে ইংরেজ শাসক ও দেশীয় জমিদারদের সম্মিলিত শক্তির পক্ষে অঞ্চলকেন্দ্রিক এই আন্দোলন দমন করা কঠিন হয়নি। অন্যদিকে ইংরেজদের উন্নততর রণকৌশল ও অস্ত্রের কাছে তিতুমীরের পরাজয় ঘটেছে। ইংরেজদের হাতে ছিল শক্তিশালী কামান, আর তিতুমীরের হাতে ছিল বাঁশের লাঠি। কাজেই বিদ্রোহের এই পরিণতি ছিল অনিবার্য।

তিতুমীরের সংগ্রাম সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনেক। তার মৃত্যুর পরও স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা থেমে থাকেনি বরং জোরদার হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলোর মধ্যে তিতুমীরের আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম সমাজ সংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে এটি বাংলার মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৯০।
২। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*, ঢাকা, ১৯৯২।
৩। সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্ড়য় উপমহাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯২।
৪। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৭।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তিতুমীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ঢাকা (খ) ফরিদপুর
(গ) চব্বিশ পরগণা (ঘ) কলিকাতা।

২। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কোথায় অবস্থিত ছিল?
(ক) বারাসাত (খ) নারিকেলবাড়িয়া
(গ) চাঁদপুর (ঘ) হায়দারপুর।

৩। তিতুমীরের বাহিনীর সেনাপতি কে ছিলেন?
(ক) গোলাম মাসুম (খ) মজনু শাহ
(গ) মিসকিন শাহ (ঘ) কেদার বক্স।

৪। তিতুমীর কত খ্রিস্টাব্দে শহীদ হন?
(ক) ১৮৫৭ খ্রি. (খ) ১৭৮২ খ্রি.
(গ) ১৮১৫ খ্রি. (ঘ) ১৮৩১ খ্রি.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। তিতুমীরের আন্দোলনের স্বরূপ কি ছিল?
২। তিতুমীর সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। তিতুমীরের আন্দোলনের কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক তাঁর বিদ্রোহের বর্ণনা দিন।

পাঠ - ৩

নীল বিদ্রোহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *বাংলায় নীল চাষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *নীল চাষের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদের বিদ্রোহের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *নীল বিদ্রোহের বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *নীল বিদ্রোহের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।*

বাংলার কৃষকেরা ১৮৫৯–৬২ খ্রি. ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ সংঘটন করে। তারা সকলে একতাবদ্ধ হয়ে নীল চাষ বর্জন করার আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকেরা সাফল্যের সাথে ইংরেজদের নীলভিত্তিক অর্থনীতিতে আঘাত হেনেছিল। এই বিদ্রোহের ফলে নীল শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং বাংলার নীলকরেরা তাদের কুঠি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করতে থাকলে ইংল্যান্ডের শিল্পোৎপাদনের জন্য সুলভে কাঁচামালের সরবরাহ আর পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। ইংল্যান্ড এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের উপনিবেশ ভারতবর্ষকে। ভারতবর্ষ শিল্পোন্নত ইংল্যান্ডের কাঁচামালের সরবরাহস্থল ও পণ্য বিক্রির বাজার হিসেবে অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে। এই সময়েই ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতির সাথে সাথে বস্ত্র রং করার জন্য নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডে নীল সরবরাহ করে বিপুল মুনাফা অর্জনের পথ হিসেবে বাংলায় নীলের ব্যবসা আরো সম্প্রসারিত করার আয়োজন করে। কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে বাণিজ্যিকভাবে নীল চাষের সূচনা হয় এ সময়ে। নীল চাষের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল এদেশে কোম্পানির অর্জিত টাকা ইউরোপে পাঠানো। নগদ টাকার বদলে এদেশে উৎপন্ন বাণিজ্যিক পণ্য ও কাঁচামাল রপ্তানির মাধ্যমে অর্থ পাঠানো ছিল বেশি লাভজনক ও বাস্তবসম্মত। এভাবেই কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপীয় নীলকরেরা এখানে নীল চাষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কলিকাতার বিভিন্ন এজেন্সি হাউজ নীল উৎপাদন ও এর রপ্তানি বাণিজ্যে পুঁজি সরবরাহ করে।

১৮৫৯ খ্রি. বাংলায় নীল খামারের সংখ্যা ছিল ১৪৩। প্রায় পাঁচশ নীলকর এসব খামার নিয়ন্ত্রণ করতো। বাংলার মোট নীল উৎপাদনের অর্ধেক আসতো দু'টো জেলা– নদীয়া ও যশোর থেকে। এই দুই জেলার প্রায় অর্ধেক কৃষি জমি নিয়ন্ত্রণ করতো নীলকরেরা। নীল চাষীরা বেশিরভাগই ছিল সাধারণ কৃষক। এই কৃষক রায়তরা জমিতে যে কোন ধরনের ফসল ফলানোর অধিকার রাখতো। ভূস্বামীর নির্দেশে বিশেষ কোন ফসল ফলাতে তারা বাধ্য ছিল না। অর্থনৈতিক কারণেই রায়তেরা প্রথমে নীল চাষ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল নীল চাষ অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক, তখন এই রায়তেরা নীলচাষে অনীহা দেখাতে শুরু করে। এবার নীলকরেরা তাদের নীল চাষের জন্য বাধ্য করে। প্রাথমিক পর্যায়ে রায়তেরা নীল চাষে আকৃষ্ট হয়েছিল দাদন বা আগাম দেওয়ার ব্যবস্থার কারণে। নীলকর রায়ত কৃষককে আগাম অর্থ দিতো। খাজনা শোধ করা, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশু কেনার কাজে ব্যবহার করা হতো এই আগাম টাকা। রায়তদের হাতে নগদ টাকা ছিল না। তারা নগদ টাকার প্রয়োজনে এই আগাম গ্রহণ করতো। কিন্তু নীল

চাষ করে তাদের লাভ কিছুই হতো না। একবিঘা জমিতে নীল উৎপাদন করতে খরচ হতো দুই থেকে তিন টাকা, আবার ঐ পরিমাণ জমিতে আয়ও হতো দুই থেকে তিন টাকা। তাই পরবর্তী সময়ে এই নীল চাষীরা আর নীল চাষে আগ্রহ দেখাতো না। কিন্তু দাদন বা আগামের টোপ যারা একবার গ্রহণ করেছিলো, তাদের পক্ষে আর এর বেড়াজাল থেকে বের হওয়া সম্ভব হতো না। হিসেবের হেরফেরে এই ঋণ তার পরিবারে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়তো। ছেলেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বাবার দাদনের হিসেব টানতে হতো। অনেক সময় নীলকরেরা সাদা স্ট্যাম্প কাগজে রায়তের সই নিতো, শর্তগুলো পরে পূরণ করে নেওয়া হতো। আবার অনেক ক্ষেত্রে শর্ত লেখা থাকলেও নীলের জমির সীমানা তাতে উল্লেখ করা হতো না। এতে করে নীলকরেরা যে কোন ভাল দামি বা ধানের জমি নীল চাষের জন্য চিহ্নিত করতে পারতো। আগাম চুক্তির শর্তানুযায়ী নীল চাষ করতে ব্যর্থ হলে নীলকর আগাম গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারতো। এমনি অবস্থায় রায়তেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীল চাষ করতে বাধ্য হতো। নীলচাষ করতে গিয়ে তারা ধান বা খাদ্য শস্য উৎপাদনে সময় দিতে পারতো না, আবার অনেক সময় ধানের জমিতে বাধ্য হয়ে নীল চাষ করতে হতো। নীল চাষে অর্থনৈতিকভাবে লাভ তো ছিলই না, এরপরও ছিল কুঠির কর্মচারীদের ঘুষ দেয়ার বিড়ম্বনা। আর কোন রায়ত যদি নীলচাষ ছেড়ে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতো, তাহলে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হতো বা আদালতে মামলা করে হয়রানি করা হতো। নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভিযোগ ছিল অসংখ্য। এর মধ্যে রয়েছে দেশীয় লোকদের খুন, জখম, গুম, দুগামে আটকে রাখা, কৃষকদের ঘরে আগুন দেওয়া বা লুটপাট করা, নীলচাষে বাধ্য করার জন্য রায়তদের আটকে রাখা, লাঠিয়াল দিয়ে গ্রাম আক্রমণ করা প্রভৃতি। নীলকরদের বিরুদ্ধে এসব নানা অভিযোগের মধ্যে আরেকটি ছিল কৃষক কন্যা ও বধুদের অবমাননা, অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ। কিন্তু এসব ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ নীলকরদের কোন বিচার হতো না বা বিচার হলেও শুধু জরিমানা করা হতো। জেলে আটক করার রায় দেয়ার ক্ষমতা মফস্বলের ম্যাজিস্ট্রেটের ছিল না। সুপ্রিম কোর্টের সে ক্ষমতা থাকলেও এবং দু'একটি মামলায় ইংরেজরা অভিযুক্ত হলেও প্রভাব খাটিয়ে তারা খালাস পেয়ে যেতো।

নীল চাষীদের অসহায় অবস্থা ও তাদের প্রতি অবিচারের সুযোগ করে দিয়েছিলো ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ আইন। এই আইনে যে কোন ব্রিটিশ প্রজা স্থায়ীভাবে ও যে কোন মেয়াদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে কোন অঞ্চলে জমির মালিক হতে পারতো। তখন থেকে নীলকরেরা জমিদারী কিনে তাদের জমি বৃদ্ধি করতে থাকে। ১৮৫৯-৬০ খ্রি. জিনিসপত্রের দাম পূর্ববর্তী কয়েক বছরের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ বেড়ে গেলেও নীলের দাম বাড়েনি। বছরের পর বছর নীল চাষ করেও রায়তদের দাদনের টাকা অনাদায়ী পড়ে থাকতো। প্রজার হিসেবে দেনাই বাড়তো।

নীল চাষের এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রায়তেরা যাবতীয় অত্যাচার ও অভিযোগের আইনসম্মত প্রতিকারে বঞ্চিত হয়ে হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তখন তাদের প্রতি দয়াশীল কয়েকজন প্রশাসকের পর্যায়ক্রমিক কিছু কার্যকলাপে উৎসাহিত হয়ে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের হেমন্তের দিকে তারা নীলচাষে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানায়। রায়তদের অনুকূলে সরকার পক্ষের এই ধরনের অনুকম্পা প্রথম লক্ষ্য করা যায় কলিকাতার কাছে বারাসাত জেলায়। এর আগে বারাসাতেই তিতুমীরের নেতৃত্বে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কলিকাতার কাছাকাছি বলে বারাসাতের রায়ত শ্রেণী ছিল বেশি অধিকার সচেতন। এছাড়া একই কারণে যেসব অফিসার এখানে নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাও প্রভাবশালী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। নির্যাতিত রায়তদের পক্ষে প্রথম যে সরকারি আমলা এগিয়ে আসেন, তিনি ছিলেন কলারোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভি আবদুল লতিফ। ১৮৫৪ খ্রি. তিনি রায়তদের ওপর নীলকরের নির্যাতন বন্ধ করার জন্য এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করেন। এছাড়া রায়তদের ওপর আইনানুগ আচরণ করার জন্য তিনি নীলকরদের ওপর হুকুম জারি করেন। অন্যদিকে নীলকরের বেআইনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য তিনি নির্যাতিত রায়তদের উৎসাহিত করেন। এসব কারণে তিনি নীলকরদের বিরাগভাজন হন এবং প্রভাবশালী মহলের চাপে তাকে বদলি করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রশাসক যিনি বারাসাতের রায়তদের পক্ষে কথা বলেছিলেন, তিনি হলেন বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জে.এইচ. ম্যাংগল্‌স। তিনি ১৮৫৮ খ্রি. মত প্রকাশ করেন যে, রায়তকে দাদন নিতে বাধ্য করা এবং ইচ্ছের বিরুদ্ধে

নীল চাষে বাধ্য করা যাবে না। এর ফলে চাষীরা সে বছর নীল চাষ করতে অস্বীকার করে। ম্যাংগল্‌স-এর এই বক্তব্য প্রদানের জন্য সে সময়কার লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডে তাকে তিরস্কার করেন। নীলকরদের চাপের মুখে ম্যাংগল্‌সকেও অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়। ম্যাংগল্‌সের পর বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট এ্যাসলি ইডেন তাঁর উদারতা, সহনশীলতা ও মানবিকতার জন্য প্রজাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তাঁর এই নীতির ফলে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের হেমন্তের দিকে প্রজারা নদীয়া-বারাসাতে নীল বিদ্রোহ শুরু করে। ইডেন নীলকরদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন রায়তদের প্রতি মানবিক আচরণ করে এবং নীল চাষের জন্য আরও বেশি মূল্য প্রদান করে।

তবে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক থেকেই রায়তদের অসন্তোষ বিদ্রোহে রূপ নিতে শুরু করে। বিদ্রোহের শুরু হয় বারাসাত থেকে এবং দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে নদীয়া, পাবনা, মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য নীলচাষভুক্ত এলাকায়। ১৮৬০ খ্রি. নীল বোনার মৌসুম শুরু হলে একযোগে সকল চাষী নীল চাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অন্যদিকে নীলকরেরাও গ্রামে গ্রামে লাঠিয়াল পাঠিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে, শারীরিক নির্যাতন ও আদালতে হয়রানিমূলক মামলা করে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করে।

নীল বিদ্রোহের নেতৃত্বে রায়ত, জমিদার ও শহরভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবাই সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ভূস্বামী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য রায়তকে নীলকরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। নীল প্রজাদের ওপর জমিদারের পূর্ব নিয়ন্ত্রণ পুনপ্রতিষ্ঠা করাও ছিল ভূস্বামী শ্রেণীর একটি অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া এর আগে নীলকরদের সাথে ব্যবসা করে বা নীলকরদের অধীনে কাজ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এমন অনেকে ভূস্বামীদের সাথে যোগ দিয়েছিল। নীল বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়। নীল বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী অন্যতম দুজন দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ছিল নীলকুঠির প্রাক্তন কর্মচারী। তারা গ্রামবাসীদের আহ্বান জানায় নীল চাষ বন্ধ রাখতে। তারা প্রজাদের দাদন মিটিয়ে দেয় এবং লাঠিয়াল এনে রায়তদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তবে লক্ষণীয় যে, বিদ্রোহ চলাকালে আঞ্চলিক নেতৃত্ব একই ব্যক্তির হাতে থাকেনি।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নীল বিদ্রোহ তুঙ্গে ওঠে। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে সরকার বিব্রত হয়ে পড়েন। কেননা নীলচাষের সাথে নীলশিল্প ছাড়াও জড়িত ছিল রপ্তানি বাণিজ্য ও কলিকাতার অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য। এসব এজেন্সি হাউজ নীল চাষে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। এদের চাপের মুখে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর পীটার গ্রান্ট গভর্নর জেনারেলের কাছে নীল শিল্পকে রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব করেন। নীলশিল্পে জড়িত বাণিজ্যিক গোষ্ঠী এবং নীলকরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের একাদশ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের অধীনে চুক্তি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার অধিকার দেওয়া হয়। এই আইনের ধারা অনুযায়ী যদি কোন রায়ত ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চের পর নীলচাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েও নীলচাষ না করে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট বাদীর অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবেন এবং অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হলে বিবাদীকে দাদনের পাঁচগুণ পর্যন্ত জরিমানা এবং তিন মাসের কারাদন্ড দিতে পারবেন। এই আইনের আরেক ধারায় নীলচাষের বিরুদ্ধে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। আইনে বলা হয়, ম্যাজিস্ট্রেটের রায় চূড়ান্ত এবং তার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে না। তবে এই আইনে গোটা নীল ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে দেখার জন্য একটি কমিশন গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। এবং এই আইনটি মাত্র ছয় মাসের জন্য বলবৎ থাকবে বলে বিধান করা হয়। কিন্তু নিপীড়িত রায়ত শ্রেণী সরকারের ওপর যে ভরসা স্থাপন করেছিল, একাদশ আইনের ফলে তাতে সন্দেহ আর অবিশ্বাস জন্ম নেয়। স্বাভাবিকভাবেই তারা মনে করতে থাকে যে, সরকার নীলকরদের দোসর। তাই রায়ত শ্রেণীর সংগ্রাম শুরু হয় নীলকর এবং সরকার উভয়ের বিরুদ্ধে। যাইহোক, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর এই ঘৃণ্য একাদশ আইনের মেয়াদ শেষ হয়।

নীল কমিশন তিন মাসের মধ্যে সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করে। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আইন করা হলো যে, কোন নীলকরই আর রায়তের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর জবরদস্তিপূর্বক রায়তদের দিয়ে নীলচাষ করাতে পারবে না; নীলের চাষ করা সম্পূর্ণভাবে চাষীদের ইচ্ছাধীন।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ নীল বিদ্রোহ থেমে যায়। তবে নীল চাষের আগের অবস্থা আর ফিরে আসেনি। বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে যশোর, নদীয়া এবং অন্যান্য বেশিরভাগ জেলায় নীলের চাষ হয়নি। এর মধ্যে অনেক কুঠি নীল ব্যবস্থা গুটিয়ে ব্যবসা পরিবর্তন করে ফেলে; আবার অনেকে কুঠি বন্ধ করে চলে যায়। এরপর কৃত্রিম নীলের আবিষ্কারের পর নীলচাষ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়।

নীল চাষীদের পক্ষে সে সময় বাংলায় অবস্থানরত কয়েকজন খ্রিস্টান মিশনারি কাজ করেছেন। এঁরা ছিলেন লুথারপন্থী প্রটেস্ট্যান্ট। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ। মানবিক কারণে তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। নিজে ইংরেজ হয়েও তিনি ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের বীভৎসতা তুলে ধরে একটি পুস্তিকা লেখেন। এজন্যে তাঁকে আদালতে কারাদন্ডের মুখোমুখি পর্যন্ত হতে হয়েছিল।

নীলচাষের নিপীড়িত রায়তের পক্ষে সামনে এগিয়ে এসেছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন উৎপীড়িত রায়তের প্রকৃত বন্ধু। নীলচাষীদের প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে জেনে খবর পরিবেশনের জন্য তিনি নীল জেলাগুলোতে সাংবাদিক পাঠান। সাংবাদিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ এবং মনমোহন ঘোষ। এরা মফস্বলের সরকারি কর্মচারিদের অযোগ্যতা ও নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ঘটনা তুলে ধরেন। শিশিরকুমার ঘোষ নীল বিদ্রোহের সময় যশোর হতে বিদ্রোহের খবর নিয়মিতভাবে হিন্দু প্যাট্রিয়টে পাঠাতেন। নীল কমিশন গঠনে এদের প্রতিবেদনের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৮৬০ খ্রি. দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তকারী নাটক 'নীল দর্পণ' নীলকরদের অত্যাচার ও কৃষকদের দুর্দশা সাহিত্য মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কলিকাতায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে তুলে ধরে। পরবর্তী সময়ে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলে ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

নীল বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে অন্যতম সফল গণবিদ্রোহ। বাংলার সকল কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে নীল বিদ্রোহ সামাজিক গুরুত্বে, ব্যাপকতায়, সংগঠনে, দৃঢ়তায় ও পরিণতিতে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। এই নীল বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হতে শিখিয়েছিল। কলিকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আলোড়িত করেছিল এই বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহে ধনী জমিদার থেকে শিক্ষক, সাংবাদিক, ভূস্বামী, রায়ত– সবাই ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার প্রয়াস পান। এই বিদ্রোহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিল এবং নীল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম বহিপ্রকাশ ঘটে।

সারসংক্ষেপ

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে কাঁচামাল সংগ্রহের একটি ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয় ব্রিটেনের বাংলা উপনিবেশ। বস্ত্র শিল্পের রঞ্জক হিসেবে নীলের চাষ ও তা ইংল্যান্ডে রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা সূত্র খুঁজে পায় নীলকরেরা। রায়তদের জোর করে নীল চাষে বাধ্য করে তারা। কিন্তু অলাভজনক হওয়ায় রায়তেরা নীলচাষে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। নীলকরদের অত্যাচারে ঐক্যবদ্ধ কৃষক সমাজ ১৮৫৯-৬২ খ্রি. পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সময়ে নীল বিদ্রোহ গড়ে তোলে। সরকার ১৮৬০ খ্রি. নীল কমিশন গঠন করে। কমিশনের সুপারিশে রায়তের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে নীলচাষে বাধ্য করাকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। ব্লেয়ার বি. ক্লিং, *নীল বিদ্রোহ, বাংলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২*(অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৯৫।
২। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৩।
৩। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৯০।
৪। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদক), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৮৬।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় কোন সময়ে?
(ক) ১৮৩১-৩৪ খ্রি. (খ) ১৮৫৯-৬২ খ্রি.
(গ) ১৮৪৯-৫২ খ্রি. (ঘ) ১৮৫১-৫৪ খ্রি.।

২। দাদন অর্থ কি?
(ক) বকেয়া (খ) নগদ
(গ) ঋণ (ঘ) আগাম।

৩। নীল বিদ্রোহের সূচনা হয় কোথায়?
(ক) বারাসাত (খ) হুগলি
(গ) কুমিল্লা (ঘ) ঢাকা।

৪। নীলচাষীদের পক্ষ নিয়ে কোন ম্যাজিস্ট্রেট এগিয়ে আসেন?
(ক) সৈয়দ আমীর আলী (খ) মৌলভি আবদুল লতিফ
(গ) সৈয়দ আহমদ খান (ঘ) মীর মোশাররফ হোসেন।

৫। হিন্দু প্যাট্রিয়ট-এর সম্পাদক কে ছিলেন?
(ক) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (খ) দীনবন্ধু মিত্র
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) শিশিরকুমার ঘোষ।

৬। নীল দর্পণের নাট্যকার কে?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) মীর মোশাররফ হোসেন
(গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভারতবর্ষে নীলচাষের কারণ কি ছিল?
২। নীলচাষে রায়তদের অনীহার কারণ উল্লেখ করুন।
৩। একাদশ আইন সম্পর্কেএকটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। নীল বিদ্রোহের কারণসমূহ আলোচনা করুন।
২। নীল বিদ্রোহের বিবরণ দিন। এই বিদ্রোহের গুরুত্ব কি ছিল?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (গ); ২। (ক); ৩। (ক); ৪। (ঘ); ৫। (ক); ৬। (খ)।
পাঠ-২ ঃ ১। (গ); ২। (খ); ৩। (ক); ৪। (ঘ)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (খ); ২। (ঘ); ৩। (ক); ৪। (খ); ৫। (ক); ৬। (গ)।